সুমনের স্বপ্ন ও টুকরো টুকরো ক'য়েকটি ছবি

সবিতা রায় চৌধুরী

সুমন খুব ছোট থাকতেই বাবাকে হারায়। মা অনেক কষ্ট করে সুমনকে ম্যাট্রিক পাস করায়। তখনকার দিনে গ্রামে একটি ছেলে ম্যাট্রিক পাস করলে হৈচৈ পড়ে যেত। সুমনের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হল না। গ্রামের ছেলে গ্রামেই রয়ে গেলেন। গ্রামের ইএকটি হাইস্কুলে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন। বেশ কাটল মাকে নিয়ে কয়েক বছর। কিন্তু হঠাৎ দাবানলের মত জ্বলে উঠল ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের হিন্দু-মুসলমানের মরণ নৃত্য। একসঙ্গে যারা এতকাল এক মায়ের সন্তানের মত বড় হয়েছে। ইংরেজরা যাবার সময় একেবারে খালি হাতে গেল না। মরণ কামড় দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে গেল বিষ। সেটা কেউ বুঝতেও চাইল না। সবাই আপন আপন প্র াণ নিয়ে পালাতে লাগল। কিন্তু গ্রামের বেশির ভাগ লোকের নগদ টাকা হাতে থাকত না। ধান-পাট হল তাদের সংবৎসরের খাবার। তবুও যা কিছু হাতে ছিল তা নিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রাণ নিয়ে ছুটতে লাগল। সুমনও তার যে কটা টাকা ছিল তাই সম্বল করে একমাত্র মাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাগান-জঙ্গল পেরিয়ে অনেক কষ্টে যখন শিয়ালদহে এলেন তখন দেখলেন নিজেদের চেনাজানা আর কেউ নেই। মা জ্বরে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। মাথার কোন ঠিক নেই। পাশের একজনকে বললেন, 'মাকে একটু দেখুন, যদি একটু জল পাই।' বলেই ছুটে যায়। মাথায়, চোখেমুখে জল দিতেই জ্ঞান ফেরে। দুই দিনের না খাওয়া ও হাঁটার দণ কিছুই বলতে পারছেন না। শরীর অত্যন্ত দুর্বল তাই তিনি আবার দুধের খোঁজে বেরোলেন। একটু পরেই তিনি দুধ নিয়ে ফিরলেন। তখন মা আর নেই। হাত থেকে দুধের বাটি পড়ে যায়। মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে সুমন। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুধ আর তিনি ছোঁবেন না। তারপর থেকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ননীবাবু নামে এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হয়। কথায় সুমন দেশে কী করতো এখন কী করছে সবকিছুই ননীবাবু জেনে নিলেন। সুমন মনে মনে ভাবলেন, লোকটা কি চায় ওর কাছে। লোকটা ওর পিছু ছাড়ল না। সব শুনে ননীবাবু বললেন, 'কাজ করবে?' সুমন মনে মনে ভাবলেন কাজ তো একটা করতেই হবে। তাই বললেন — 'হ্যাঁ'।

'কি কাজ শুনবে না?'

— 'না, যা দেবেন তাই করব।'

ননীবাবু তখন বললেন , 'হৃদয়গ্রামে, বনজঙ্গল কেটে কিছু লোকবসতি গড়ে উঠেছে। ইচ্ছা একটা স্কুল করবো। সমস্ত দায়িত্ব তোমার। পারবে কি?'

—'তা সবাই যদি চান, না পারার তো কিছু নেই।'

–'টাকা পয়সা কিন্তু খুব কম।'

— 'একা মানুষ। যা পাব তাতেই আমার চলে যাবে।'

ননীবাবু মানুষ চিনতে ভুল করেন না। হৃদয়গ্রামে সবার সামনে সুমনকে দেখিয়ে বললেন, ইনি ওই দেশে স্কুলমাস্টার ছিলেন। দেখুন একে দিয়ে আপনাদের মনের ইচ্ছা পূরণ হয় কিনা, সবাই যেন হাতে স্বর্গ পেল। সামনের জায়গাটা বনজঙ্গলে ঢাকা ছিল, দুদিনের মধ্যে সাফ করে তৈরি হল চালাঘর। কিছুদিনের মধ্যেই সেই চালাঘর ছাত্রে ছাত্রে ভরে গেল। সুমনের পড়ানোতে সবাই খুশি। ভর্তি ফি দু'টাকা। মাসের মাইনে দু'টাক া। সেই টাকায় গরীব ছেলেদের টিফিন আর ক াগজকলম দেওয়া হত। নতুন নতুন বাড়ি হতে লাগল। নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের মুখ দেখা দিল স্কুলে। স্কুলের আরো মাস্টার দরকার। আরো ঘর দরকার। গ্রামের সকলের চেষ্টায় স্কুলটাকে অ্যাপিলিয়েশন করানো হল। তবে তার আগে উপরওয়ালারা এসে সব দেখে নির্ধারণ করেন উপযুক্ত কিনা; তারপর পারমিশন দেন। দেখতে দেখতে স্কুলের চেহারা বদলে গেল। পাকা ঘর উঠল, আরো দুজন মাস্টার নিযুক্ত করা হল। অবশ্য সুমনকে হেডমাস্টার পদে নিযুক্ত করা হল। সুমন কিন্তু সেই ভদ্রলোককে ভুলতে পারেননি। মাঝে মাঝে দেখা করেন। একদিন ননীবাবু বললেন, 'এইবার দু কাঠা জমি কেন। টাকা তো উপর থেকে দিচ্ছে।' সেদিন সুমন বুঝতে পরলো ননীবাবু জমির কারবার করেন। তবে লোকটা খাঁটি। সুমন বললেন, 'দূর, আমি তো একা দাদা। বাড়ি কি হবে? এই বেশ আছি দাদা।'

ননীবাবু কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে দুদিন বাদে একটা দলিল এনে সুমনবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'দাও তো একটা সই করে।'

সুমন বললেন, 'একি, এতো একটা জমির দলিল।'

— 'হ্যাঁ সে তো বুঝতেই পারছো। তাড়াতাড়ি সইটা কর। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

অগত্যা সই করতে হল। ননীবাবু প্রতিমাসে সুমনের কাছ থেকে দুইশো করে টাকা নিয়ে যান। সুমনও কোনদিন জানতে চাননি। তিনি বুঝেছেন যে, ননীবাবু জমির দ ালাল হলেও লোক ঠকান না। যা পান তাতে মা আর ছেলের কোনোরকমে চলে যায়।

সুমন এখন নিজের বাড়িতেই থাকেন। হঠাৎ একদিন ননীবাবু তার খাওয়ার হাল দেখে বললেন, ' তোমার তো রান্না করে খাওয়া চলবে না ভাই।'

— 'না, না, এই বেশ আছি।'

ননীবাবু বললেন, 'জান ভাই, সবারই বুকে ব্যথা থাকে। কেউ বলতে পারে, আবার কেউ বা বলতে চায় না।' এরপর ননীবাবু একদিন খবরের কাগজ খুলে দেখতে পান বড় বড় হরফে লেখা 'হৃদয়গ্রাম সবুজ বিদ্যাপীঠ।' তিনি কাগজখানি নিয়ে সমুনের হাতে দেন। সুমনের চোখেমুখে যেন খুশির আলো ভেসে ওঠে। এরও কয়েকমাস পর ইস্কুলের এক ছাত্রের দিদির বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে একটু অবাক হয়ে যান সুমন। বাড়িটা থম্‌থমে। আনন্দের কোন চিহ্নই নজরে পড়েন া। এর মধ্যে কোথা থেকে ননীদা এসে বললেন, 'আরে এসে গেছো! চলো চলো! লগ্ন যে বয়ে যায়।'

— 'তার মানে?'

--- 'মানে পরে বলব। আগে বুড়ো বাপটাকে বাঁচাও। পণের টাকা না দিতে পারায় বর উঠিয়ে নিয়ে গেছে। তাই বলছি, তুমি যখন আমাকে দাদা বলে ডাক, তখন দাদার অনুরোধটুকু রাখ। মেয়েটাকে বাঁচাও। রাত পোহালে মেয়েটার যে কি অবস্থা হবে।'

সুমন আর কোন কথা বললেন না। সেই রাতেই ওই মেয়েটির সাথে বিয়ে হয়ে গেল। এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। ননীদার মা মারা যাওয়ার পর ননীদা কোথায় হারিয়ে গেলেন -- কোন খোঁজ পাননি।

সুমনেরও মাথার চুলে পাক ধরেছে। স্কুলের কাজে অবসর নিয়েছেন। এক ছেলে এক মেয়ে। সংসারে খুব অনটন। এতদিন যা পেয়েছেন নিজের আদর্শ বজায় রাখতে তা গরীব ছেলেমেয়েদের দান করেছেন। এদিকে জমার খাতা শূন্য। ছেলে শতরূপ বি.এ. পাশ করে চাকরী না পেয়ে ট্রেনে হকারী করে। তা থেকে যা হয় তাই দিয়ে সংসার চলে। মেয়ে শতরূপা বারো ক্লাস পাস করেছে। আর্থিক অনটনের জন্য তারপর আর পড়া হয়নি। কয়েকবার পেনশনের জন্য অফিসে গিয়েও সুমন নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। শেষবার অক্ষয়বাবু তাকে বলেছিল, "দাদা আপনি হলেন একজন আদর্শবাদী লোক। আপনার পেনশন পেতে একটু দেরি হবে। আজকাল এইসব কাজ আর সোজা পথে হয় না।'

সুমনবাবুর মাথায় এখন একটাই চিন্তা, কি করে মেয়েটাকে সৎপাত্রে দেওয়া যায়। সুমনের স্ত্রী সহিষ্ণু এতদিন কোন কাজে বাধা দেয়নি বা প্রতিবাদ করেনি। কারণ সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা তার মনে পড়ে যায় বার বার। সেই রাতে যদি এই দেবতুল্য মানুষটি সেখানে গিয়ে না দাঁড়াতেন তবে আজ তার সমাজে ঠাঁই হত কোথায়? কিন্তু আজ আর না বলে পারল না। বলল, ' জেরাগ্রাম থেকে ছেলের বাবা চিঠি পাঠিয়েছে। ওঁরা বৈশাখ মাসেই কাজ করতে চায়।' সুমন কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন। ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়েন। যাবার সময় বলে যান, 'আমি কলকাতায় যাচ্ছি।' কলকাতায় পৌঁছে জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইদের কাছে সব কথা খুলে বলতে তারা খুশিমনেই সুমনকে কিছু টাকা দিল। সুমন গুনে দেখলেন চার হাজার টাকা। নিজের আদর্শে আঘাত লাগলেও চোখেমুখে ফুটে ওঠে আশার আলো। শনিবার ট্রেনে খুব একটা অসুবিধা হয় না। কিন্তু একটু পরে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি ছেলে হুড়মুড় করে গায়ের ওপর এসে বসে। সুমনবাবু একটু সরতেই ছেলেটি বলে, 'আরে মাস্টারমশাই না!' সুমনবাবু একটু তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ঝড় না!' ঝড় 'হ্যাঁ, মাস্টারমশাই,' বলেই প্রণাম করে। সুমনবাবু ঝড়ের মাথায় হাত দিয়ে বলেন, ' বেশ বেশ, তা এখন কি করছ?'

'এই টুকিটাকি। বাড়ির সবাই ভালো? শতরূপা কেমন আছে?' ঝড়ের মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার কথা। তার ছোট বেলায় মা-বাবা যাবার পর দেখবার কেউ ছিল না। বাড়ি বাড়ি কাজ করত। তবেই খেতে পেত। এই মাস্টারমশাই তাকে খাইয়ে পড়িয়ে বড় করেছেন। আর আজ তারই কিনা.....।

'ও! তোমাকে তো বলা হয়নি। শতরূপার বিয়ে।' বলেই সুমনবাবু জামা আর প্যান্টের পকেট পাগলের মত খুঁজতে থাকেন।

ঝড় বলে, 'অমন করছেন কেন? কিছু হারিয়েছে?' ধরা গলায় বলেন, 'টাকা! টাকা কোথায় গেল? কি করে কাজ হবে?'

ঝড়ের মনের ভেতরে তখন ঝড় উঠেছে। না এ অন্যায় সে কিছুতেই করতে পারে না। সে বলে, 'আপনার পায়ের কাছে ওটা কি দেখুন তো।'

সুমন তাকিয়েই বুঝতে পেরে দুহাতে টাকার বান্ডিলটা তুলে নেন। ' বেঁচে থাক বাবা। সুখি হও।'

-- 'চলি মাস্টারমশাই। শতরূপার বিয়ের দিন যাব।'

বাড়ি ফিরে বিয়ের সমস্ত রকম ব্যবস্থা করতে দুদিনের কাগজ দেখার সময় পাননি সুমন। তাই আজ দুপুরে খাবার পর দুটো কাগজ হাতে করতেই চোখে পড়ে, রবিবারের কাগজে বড় বড় হরফে লেখা 'ছিনতাইকারীদের টাকা লেনদেন নিয়ে মারপিট, একজনের মৃত্যু। মৃত ব্যক্তির নাম ঝড়।' সুমনবাবুর হাত থেকে কাগজটা পড়ে যায়। বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। তবে কি ঝড় নিজের প্রাণ দিয়ে ঋণ শোধ করল? চিন্তা করার সময় পান না। হঠাৎ ডাকপিওন একটা চিঠি দিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে দেখেন ননীদার লেখা। 'সুমন, একদিন তোমায় বলেছিলাম, সবার মনেই ব্যথা। কেউ বলে, কেউ বলতে পারে না। তোমাকে প্রথম দেখে চমকে উঠেছিলাম। দুবার চোখ রগড়ে, মনে ভেবেছিলাম, এও কি সম্ভব? চোখের সামনে যাকে কুচিকুচি করে কেটে ফেলল! বিশ্বাস করতে পারিনি। পিছু নিলাম। সব শুনলাম। ততক্ষণে আমার বুকে ভাইয়ের খালি জায়গাটা দখল করে ফেলেছ। সেই অধিকারে আমার যা কিছু সব তোমার। মূল্যবান কাগজপত্র সবই এরমধ্যে পাবে। পালিয়ে এসেছিলাম তোমাকে ভুলব বলে। কিন্তু পারিনি আজও।' চিঠিটা পড়তে সুমনের দুচোখে জলের ধারা বয়ে চলে। ননীদার স্নেহ-ভালোবাসা, ঝড়ের আত্মবলিদান -- এসব কিছুর কাছে সুমনের আদর্শ যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com